২৪-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র শিববাবাই আছেন, যাঁর এত অপরম অপার মহিমা। বাবার মতো এত মহিমা এ জগতে আর কারও হতেই পারে না।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কেন এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে খুব যত্নের সঙ্গে ও গভীর মনযোগের সাথে তোমাদের তা করা উচিত ?

উত্তর :- কারণ সমগ্র কল্পের মধ্যে কেবলমাত্র একবারই এই সঙ্গমকালে পরমাত্মা শিববাবা পরমধাম থেকে এখানে আসেন, আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জ্ঞানের পাঠ পড়ানোর জন্য। জগতের মানুষ তো পড়াশোনার জন্য ভারত থেকে বিদেশেও যায়, যা কোনও বিশেষ কথা নয়। কিন্তু এখানে এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক আরও কত অনেক দূর দেশ (পরমধাম) থেকে আসে। সেজন্যই তো বাচ্চাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পড়ায় খুব যত্নের সাথে গভীর মনোযোগী হতে হবে। এই পঠন-পাঠনের যদি সামান্য কিছু অসুবিধাও হয়, সেটাকে গ্রাহ্য করবে না কিন্তু। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় প্রতিটি গলির আনাচে-কানাচে তৈরি করতে হবে, না হলে এত সব বাচ্চারা কি করেই বা এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কেননা সবারই তো অবশ্যই এই বাবার প্রকৃত পরিচয় জানা দরকার।

ওঁম্ শান্তি! কে তোমাদের মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বলে এমন সম্বোধন করেন ? - তিনি কে ? তিনি তো কোনও সাধু-সন্ন্যাসী বা মনুষ্য আত্মা নয়। নাকি তা অন্য কোনও বস্তু বিশেষ ? জগতের লোকেরা তো সাধু-সন্ন্যাসীদের ঝট্ করে চিনে ফেলতে পারে, তাই তারা তাদের নাম ধরেই বলে 'ইনি হলেন অমুক মহাত্মা, উনি হলেন অমুক মহাত্মা, ইত্যাদি'। কিন্তু এই বাবাকে তো কেবল ওঁনার (বি কে) বাচ্চারাই তা জানতে পারে। আত্মাদেরকেই তো বাচ্চা বলা হয়। আর এই আত্মারাই এইসব কিছু জানতে পারে, কিন্তু শরীর নয়। তাই আত্মারাই সে কথা বলে থাকে, 'ইনি অমুক'। আর আত্মা তার ইন্দ্রিয় দ্বারাই তা উপলব্ধি করতে পারে। আত্মা যদি শরীরে না থাকতো, তা হলে চোখের দ্বারাও সে কোনও কাজ করতে সমর্থ হতো না। কারণ সবকিছুই যে অনুভূত হয় এই আত্মার দ্বারাই। তাই, এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (বি.কে.) বাচ্চাদের আত্ম-অভিমানী বানানো হচ্ছে। যেহেতু আত্মারাই তা বলে থাকে- 'আমি এই কর্মন্দ্রিয়ের দ্বারাই অমুক কর্ম-কর্তব্য করেছি'। তাই বাস্তবে আত্মাকে মেল (পুরুষাকার) বলা হয়, ফিমেল (মহিলা) বলা হয় না। মেল (পুরুষ) হবার কারণে আমরা সকল আত্মারাই হলাম ভাই-ভাই সম্পর্কের। যদিও এটা এখন তোমাদের কাছে নতুন কথা মনে হবে। কিন্তু জগতের লোকেরা তো শিববাবাকে উদ্দেশ্য করে বলবে - যিঁনি এই ধরাতলে এসেছেন ইঁনি তবে কে ? ওনার কি কোনও মানুষের আকার নেই ? কেবল নামের দ্বারা জানা যায় যে, উঁনি বেহদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। যিঁনি ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমেই এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়িয়ে থাকেন। অথচ, আবার এমনও নয় যে তিঁনি কোনও অমুক সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁরই আত্মা এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়িয়ে থাকেন। কিন্তু, এরকম-টা মোটেই হয় না। কারণ মানুষেরা তো তাদের নাম-রূপের দিকেই বেশি মনোযোগী থাকে। তোমরা (বি কে-রা) তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা এসব কিছুই বুঝতে পারো যে, এই শিববাবাই হলেন আমাদের বেহদ-অসীমের বাবা। তিনি ব্রহ্মার শরীরের প্রবেশ করে আমাদেরকে ওঁনার আশীর্বাদী-বর্সা দেন এবং রাজযোগ শেখান। এলমাত্র উঁনিই হলেন জগতের সকলেরই পিতা। তিঁনিই সকল পতিত আত্মাদের পবিত্র-পাবন বানান। কেবল

মানুষকেই নয়, এমনকি আত্মা ব্যতীতও পঞ্চ তত্বকেও পবিত্র বানান-একমাত্র উঁনিই। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার সবকিছুরই সদ্‌গতি যিনি করেন, তিঁনি হলেন সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র শিববাবা। তাই পুরো সৃষ্টি-জগতে এক পরমাত্মার-ই এমন মহিমা করা যায়, এ ছাড়া দ্বিতীয় কারো নয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর ইত্যাদি দেব-আত্মাদেরও এত মহিমা করা যায় না। তা হলে তাদের জন্মদিনই বা পালন করবে কি করে! লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের যুগ্মরুপ হল বিষ্ণু, তিনি এখন কোথায় ? এই লক্ষ্মী-নারায়ণই তো পুণঃজন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিমে অর্থাৎ শেষ জন্মে পদার্পণ করেছেন এবং পুনরায় শিববাবাই ওনাদেরকে যোগ্য সন্তান বানাচ্ছেন। কারণ এই এক শিববাবাই হলেন সকলের সদ্‌গতি দাতা। তাই মহিমাও একমাত্র তাঁকেই করা হয়। সেই পতিত- পাবন পরমাত্মা ব্যতীত দৈবী সৃষ্টির এখন কি দুরবস্থায় এসে পৌঁছেছে, দেখ ! যদি কৃষ্ণের ভক্তদের জিজ্ঞেস করা যায়, রাধা-কৃষ্ণ এখন কোথায় ? তখন তারা জানাবে রাধা-কৃষ্ণ তো সর্বব্যাপী-ই বিরাজমান। রাধার উপসনাকারীরা বলবে, 'সর্বত্র কেবল রাধাই রাধা'। হনুমানের পূজারীরা বলবে- 'যেদিকেই তাকাও সর্বত্রই কেবল হনুমান আর হনুমান'। কিন্তু বাস্তবে তো আর তা নয়। বাবা স্বয়ং তো আর তার নিজের মহিমা গাইবেন না। তিঁনি কেবল তাঁর কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের দ্বারা, তাঁর মহিমা সিদ্ধ করেন, তাই তো অন্য আর কারো মহিমাই কীর্তনের যোগ্য হয় না। সত্যযুগ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল। যারা শৈশবে রাধা-কৃষ্ণ নামে খ্যাত ছিল। এরা এদের পুরুষার্থের কর্ম-ফলের প্রালব্ধের দ্বারাই তা পেয়েছেন। তাই তো সেক্ষেত্রে এনাদের মহিমা সেভাবে করা যায় না ! ব্রহ্মাও কিন্তু সে মহিমার যোগ্য নয়, বিষ্ণুরও সে মহিমা নেই। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মারই এমন মহিমা করা যায়। তাই একমাত্র ওঁনাকে পতিত-পাবন বলা হয়। এখন তো তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জেনেছো যে, এই বিষ্ণু আসলে কে! বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রসহ সূক্ষ্মলোকেই বা কেন দেখানো হয়েছে ? কোন মানুষেরই তো দুয়ের অধিক হাত হয় না। তার উপরে আবার সূক্ষ্মলোকে ওনার চার হাত দেখানো হয়েছে। আর তা করা হয়েছে প্রবৃত্তি-মার্গকে সিদ্ধ করার জন্যই। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তো তোমরা জানতে পেরেছো যে, তোমাদের (ব্রাহ্মণেদের) ৮৪ জন্ম হয় কিভাবে। সত্যযুগে তোমরা গৃহস্থ্য জীবনেও পবিএ-পাবন ছিলে। তাই তো মন্দিরে গিয়েও তাঁর উদ্দেশ্যেই গানও গাইতে থাকো - "ওহে, সর্বগুণ সম্পন্ন - তুমিই।আমাদের মাতা-পিতা"। সেই মহিমাই এখন আবার উল্টো হয়ে গেছে। কিন্তু, এমন মহিমা তো কেবল এক ও একমাত্র শিববাবারই হতে পারে। যা দেবতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোয্য নয়। এমন যা কিছু মহিমা আছে তা সবই কেবল এই এক শিববাবারই। তিঁনিই হলেন আত্মাদের পরমপিতা-পরমাত্মা। তিঁনি একাধারে পরমপিতা, পরম শিক্ষক, পরম সদগুরু এবং তিঁনিই অ-কাল (জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে), এমনটাই ওঁনাকে বলা হয়। তাই তো ওঁনাকেই স্মরণ করা হয়। যেহেতু উঁনি হলেন অ-কালমূর্ত অর্থাত জন্ম-মৃত্যুর বিধাতা। শিববাবাকে ষাঁড়ের উপর আসীন অর্থাৎ তাঁর বাহন রূপে দেখানো হয়েছে, আবার ওঁনাকেই স্থির সিংহাসনেও (অকাল তখৎ) দেখানো হয়, কারণ জগতের লোকেরা তো এটাই জানে না, শিববাবা আসলে কে! তারা মন্দিরে যা কিছু দেখে তা তো তাঁর অসম্পূর্ণ অংশ মাত্র। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে তিঁনি তো হলেন জ্ঞানের-সাগর, পতিত-পাবন। কর্ম-কর্তব্য সমাধা করার জন্য শিববাবার তো মানুষের শরীরের প্রয়োজন। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই তা জানো যে, শিববাবার সেই সিংহাসন হলো ব্রহ্মার শরীর। ধর্ম স্হাপকদের তো আর এমন কোনও মহিমা থাকে না ! তারা আসেন তো কেবল ধর্ম প্রচার করতে। তারা কেউ তো আর কোনও আত্মাকে জীবনমুক্তি দিতে পারেন না। অথচ, জগতের মানুষেরা চায় - মোক্ষ প্রাপ্তি করতে পারলে (জীবন থেকে মুক্ত হতে পারলে) তবে তাদের আর এই দুনিয়ায় আসতেই হবে না। ফলে, এইসব ধর্ম স্হাপকরা নিজের ধর্মের লোকদের কেবল

আরও নীচে নামার দিশা দেখাবার নিমিত্তই হচ্ছে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী ধর্ম-স্হাপকরা আবারও জন্ম নিয়ে, আবারও এই ভাবেই ধর্ম স্হাপন করবেন। যেহেতু এটাই এই নাটকের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে। যারাই (সব আত্মাই) এই ধরাতলে এসেছে, তাদের সবাইকে অবশ্যই পুনর্জন্ম নিতে হবে। আর এ সবই স্থাপনকারী বাবাই করান, একমাত্র তিঁনিই হলেন সবার পতিত-পাবন, উঁনি ছাড়া আর কেউই পতিতকে পাবন বানাতে সক্ষম হন না। জগতের মানুষেরা তো আসে কেবল মাত্র নিজের নিজের পার্ট অর্থাৎ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে। সকল আত্মাকেই সতো, রজো ও তমো-তে আসতেই হয়। যেমন, ধর্ম স্হাপকরা এসে কেবল ধর্মের প্রচার করেই খালাস। ওনারা যে রকম শিক্ষা দেন সেই অনুসারে শাস্ত্রও বানানো হয়। ধর্ম স্হাপকদের অবশ্যই তার অনুগামীদের পালনাও দিতে হয়। কিন্তু মাঝপথে (কল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত) আত্মারা কেউ নিজধামে ফিরতে পারে না। বর্তমান সময়ে সকল আত্মাই তাদের ভিন্ন-ভিন্ন নাম-রূপ নিয়ে এই পতিত দুনিয়াতেই রয়েছে। যদি প্রথম সারির প্রথম-প্রথমাদের অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাই ভাবো, তারাও কোনও নাম-রূপে এই দুনিয়াতেই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণরা রচিত হয়েছে। এনারাই (ব্রহ্মা ও মাম্মা) সত্যযুগে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণে পরিণত হবেন। যতক্ষণ না শিববাবা এই পতিত দুনিয়ায় আসবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও আত্মাই পবিত্র-পাবন হতে পারবে না। তাই তো তাঁর প্রতি সবাই বলিহার হয়ে সমর্পিত হয় আর তাঁরই গুণগান ও মহিমা কীর্তন করে। জগতের মানুষেরা তো এমনও বলে --'শিবায় নমঃ, তুমিই হলে মাতা-পিতা, আমাদের সব, ইত্যাদি বলে তাঁকেই (পরমাত্মা) স্মরণ করতে থাকে। সব থেকে বেশী গুনের কীর্তন ও মহিমা তো এই এক বাবারই করা হয়। তাই তো এভাবে বাবাকে ও 'গড-ফাদার' বলে আহ্বান করে। এমন ভাবে তারা কেবল এই এক বাবাকেই ডাকে। অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য এই ভাবে আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। যখন এই সৃষ্টি-জগৎ একেবারেই পুরনো হয়ে যায়, তখনই পরমাত্মা শিববাবা এই দুনিয়ায় পদার্পণ করেন এবং উঁনি বাচ্চাদেরকে মূলবতন, সুক্ষ্মলোক, স্থূল লোক - এই তিন লোকেরই জ্ঞান দিয়ে থাকেন। পুরো কল্পে এই জ্ঞান কেবলমাত্র একবারই অর্থাৎ এই কলিযুগের অন্তিমকালে, সঙ্গমেই দিয়ে থাকেন। একমাত্র শিববাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আর সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি হল বেহদ মন্ডপের পবিএ বাতি স্বরূপ। রাত ও দিনের ব্যাপারটাও সেই বেহদ মন্ডপের আলো-আধাঁরের কাজ করে। তাই এমনটা বলা যায় না যে, 'সূর্য দেবতা নমঃ'। সেটা কখনই বলা উচিত হবে না। দেবতারা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর। সকল আত্মাই যখন পরমধাম থেকে এখানে আসে, তখন তারা সূক্ষ্মলোকে না গিয়ে সরাসরি জীব-আত্মার গর্ভে প্রবেশ করে। আবার সত্যযুগের আত্মারা সোজা গর্ভ-মহলে এসে প্রবেশ করে। যেহেতু তখন তো কাম-বিকারের মতো কোনও পাপ কর্ম হয় না। এই জগতের মানুষেরা এতই পাপ কাজ করে, তাই তারা ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে, আর ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে বলে- 'এবার আমাদের বাইরে বের করো, আমরা আর পাপ-কর্ম করবো না'। কিন্তু বাইরে বেরিয়েই যথারীতি পূর্ববৎ পাপ-কর্মে নিযুক্ত হয়ে যায়। পূর্বে যেমনটি (পাপী) ছিল, তেমনিটিই হয়ে যায় আবার। যদিও এসব অবিনাশী নাটকের চিত্রপটেই নিহিত আছে। ভারতের সবচাইতে বড় শত্রু হলো রাবণ রূপী বিকার। দ্বাপর যুগ থেকে এই রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। যেহেতু দ্বাপর যুগ থেকেই দেবী-দেবতারা বাম-মার্গে যেতে শুরু করে। সেই স্মৃতিতেই তাঁদের মন্দিরও স্থাপন করা হয়। পুরীতে দেখ, কি সুন্দর বিশাল মন্দির রয়েছে, যেখানে ভিতরে জগন্নাথের মূর্তি রাখা হয়েছে। ভিতরে দেবতা রাখা আছে আর বাইরে দেবতাদের কি নোংরা নোংরা চিত্র দেখানো হয়েছে। এই ধরনের চিত্র অবশ্যই কোনও মন্দিরে থাকা উচিত নয়। তোমরা বাহ্মণেরা তো এখন বাবার শ্রীমতে থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করছো, কেননা সত্যযুগের প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ হন। তাঁরা (লক্ষ্মী-

নারায়ণ) কিভাবেই বা এই শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হয়েছেন, সেই পাঠই এখন তোমারা পুনঃরায় পড়ছো। বাবা বলছেন – 'কল্পে কল্পে, অর্থাৎ প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে আমি আবার এই ধরায় আসি এবং এভাবেই প্রতি কল্পেই আসতে থাকবো। আবার আমি তোমাদেরকে এই রাজযোগের পাঠই শেখাবো। তোমরাও আবার ক্রমাগ্বয়ে সতো, রজো, তমোতে আসবে। তোমারা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যারা শুরু– শুরুতেই আসবে, কেবল তারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করবে, বাকিরা নয়'। কারণ ৮৪ লাখ বার তো জন্ম হয় না। (উদ্দেশ্য /লক্ষ্য ৮৪–কে ৮৪ লাখ, এভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। জগতের লোকেরা যদি কারও কাছ থেকে কিছু শোনে, তাহলে সেটাকে এইভাবেই শত–রও শতগুণ বাড়িয়ে বলতে থাকে। আর যদি ৮৪ লক্ষ বার জন্ম হতো, তা হলে তো প্রত্যেক কল্পের আয়ু আরও অনেক গুণ বেড়েও যেত। বাবা স্বয়ং স্পষ্ট করেই বলেন – কল্পে মোট ৮৪ জন্ম হয়, কেবল দেবী–দেবতাদেরই। আচ্ছা, তা হলে ইসলামী, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্মের আত্মারা কত বার জন্মগ্রহণ করবে ! শাখা প্রশাখার ন্যায় এত যে আত্মারা আসে, তাও কিন্তু হিসাব অনুযায়ীই। তোমরা ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টির সমস্ত– আদি, মধ্য ও অন্তের বিষয়ে জানো। সর্ব প্রথমে একমাত্র ভারত–ই ছিল সমগ্র বিশ্বের মালিক, যখন আর অন্য কোনও ধর্ম সেই সময়ে ছিল না। কিন্তু এখন সেই দেবী–দেবতা ধর্মের নাম–নিশান পর্যন্ত নেই। যেহেতু তাদের নিজস্ব কোনও শাস্ত্রও ছিল না। এইসব গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র পরে (দ্বাপর থেকে) রচিত হয়। তবে এমনটা হয় না যে, তোমরা যাকে প্রকৃত গীতা বলে রচনা করো, সেটাই প্রকৃত মানা হবে। যে গীতা স্বয়ং শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের তিন কালের জ্ঞান দিয়ে থাকেন, সেই গীতাই পরে একসময়ে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হবে। অবশ্য ভক্তিমার্গের জন্য তো এসবেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্রহ্মার দ্বারাই শিববাবা বাচ্চাদেরকে তা বুঝিয়ে থাকেন। তাই প্রতি কল্পের মতন এই ব্রহ্মা দ্বারাই শিববাবা ভগবানকে পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। বাবা বলেন – ওসব শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা সবই হলো ভক্তিমার্গের জন্য। তিনি বলেন, "আমাকে প্রাপ্তি অর্থাৎ আমার সান্নিধ্য লাভ একমাত্র তখনই হয় , যখন আমি এই ভারত ভূখন্ডে অবতরণ করি"। যেহেতু, এই ভারতই একমাত্র অবিনাশী খন্ড। যা পূর্বে খুবই সম্পদশালী দেশ ছিল। ক্রমে ক্রমে সবই তা লুট–পাট হয়ে গেছে। দ্যাখো, এখানে সোমনাথের কত বিশাল মন্দির রয়েছে। যদিও তার প্রায় সবকিছুই লুঠ–তরাজ হয়ে গেছে। বিড়লাদের কাছ এত অঢেল ঐশ্বর্য্য থাকায় তারা কত বড় বড় মন্দিরও বানিয়েছে ! বাবা এসবই কত সুন্দর পদ্ধতিতে বোঝান, যা আর কারো পক্ষেই এমন করে বোঝানো সম্ভব নয়। জ্ঞানের সাগর শিববাবা যখন ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এত সহজ ও সরল ভাবে বোঝান, বাচ্চারাও তা সহজেই বুঝতে পারে। আসলে এই ঈশ্বরীয় পঠন–পাঠন পড়াচ্ছেন কে ? তিনি কিন্তু কোনও সন্ন্যাসী নন। ওঁনার নামই যে শিববাবা। সকল আত্মারাই তাঁর সন্তান। জগতের মানুষের (আত্মাদের) প্রতিবারই জন্মের সাথে সাথে তাদের নামেরও বদল হতে থাকে। কিন্তু ইঁনি 'শিববাবা'- অর্থাৎ পরম আত্মা কেবল এই একটা নামেই খ্যাত। তাই তিনি জানান–

'আমার একটা ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কোন নামই নেই। যেমনি তোমরা জন্ম–মৃত্যুর চক্রে আসার কারণে দেহী অভিমানীও হয়ে পরো। কিন্তু আমি কখনও দেহ–অভিমানী হই না। তিঁনি পুনর্জন্মবাদ চক্রে না আসার কারণে সর্ব–কালের দেহী– অভিমানী। তোমরা তো শিবরাত্রিও পালন করো, কিন্তু তোমরা এতই ভুলো–মনের যে, রাত্রির সঠিক অর্থটাই তোমরা কেউই বুঝতে পারো না। কল্পের এখন হলো নিশুতি–রাত, ঠিক এরপরেই তো দিন শুরু হবে। এখন এই কল্পেরও শেষ সময় অর্থাৎ গভীর রাত। এরপর সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ হবে কল্পের দিন। আবার দ্বাপর ও কলিযুগে আসবে রাত্রি। বাবা বলেন – "আমি কেবল কল্পের সঙ্গম যুগেতেই আসি" । এটাই হচ্ছে বেহদের রাত আর দিনের চক্র। ভগবানুবাচ – এটাই হলো মুখ্য সময়। কিন্তু শিববাবার বেলায় অবশ্য

একথা প্রযোয্য নয়। তিনি কখন এখানে আসবেন, তা সাধারণ মানুষেরা জানতেও পারে না। আর এই সময়টা হচ্ছে, বেহদের দিন আর রাতের সঙ্গম সময়। তাই একেই কল্পের সঙ্গমযুগ বলা হয়। জন্মদিনও সেই একজনেরই পালন করা উচিত। শিববাবা এখানে যেমন আসেন আবার পরমধামেও ফিরে যান। ওঁনার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই -তাই বলা হয় বাবা চলে গেছেন। আর এ সবই তাঁর অবিনাশী নাটকের খেলার অঙ্গ। তিনি বাচ্চাদের বোঝান, সঠিক দিশায় চলতে চলতে ব্রাহ্মণও যে ফেঁসে যায়, এই ভাবেও তিনি বাচ্চদেরকে জানিয়ও দেন। প্রথমদিকে ব্রহ্মাবাবাও তা বুঝতে পারতেন না। হঠাৎ করে তাঁর (ব্রহ্মার) শরীরে শিববাবার প্রবেশ ঘটে যায়। যদিও শুরুর একেবারে প্রথমদিকে একটু একটু বুঝতেও পারতেন, তারপর ধীরে ধীরে তিনি (ব্রহ্মাবাবা) বুঝতে পারলেন যে, শিববাবাই তাঁর (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করেন, এ একমাত্র শিববাবারই কাজ। এই রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞের মাধ্যমে বিনাশ রূপ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে। বেহদের এই যজ্ঞে কেবল বেহদের সামগ্রীই স্বাহা (ভস্ম) হয়ে থাকে। যেহেতু বেহদের বাবার দ্বারা রচিত হয় এই যজ্ঞ। তাই এরপর আর কোনও যজ্ঞই রচিত হয় না। যেহেতু, এরপর তো ভক্তিমার্গেরই অবসান ঘটে যায়। তাই এই জ্ঞানকেই বুদ্ধিতে করে রাখতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পড়া অবশ্যই পড়তে হবে। ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে আসার জন্য যদিও কোনও অসুবিধা হয়, তবুও। জগতের মানুষেরা তো জাগতিক পড়াশোনার জন্য ভারত থেকে কত দূরে লন্ডন, আমেরিকাতেও যায়। সেক্ষেত্রে এটা আর এমন কি ! বাবা বলছেন - 'বাচ্চারা, আমি কল্পে কল্পে, প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগেই, আরও কত দূর পরমধাম থেকে আসি তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াতে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদেরও কতই না যত্ন ও মনোযোগ সহকারে সেই পাঠ মনন করা উচিত। পরবর্তী কালে প্রতিটা গলির আনাচে-কানাচে এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় স্হাপিত হবে। তা না হলে বাবা তাঁর ব্রাহ্মণ বাচ্চারাদের এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়াবেন কি প্রকারে। বাবার প্রকৃত পরিচয় তো সকল আত্মাদেরই জানা আবশ্যক। শিববাবা আসলে কে, তা অবশ্যই জানতে হবে সবাইকে। *আচ্ছা*।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুনম স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁর নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন অবশ্যই পড়তে হবে, আর এরজন্য কোনও রকমের অজুহাত দেওয়া চলবে না।

২) আদি যুগের প্রথম দিকে যে রকম গৃহস্থ্য আশ্রমের পরিবেশ থাকত, বর্তমানেও তেমনি নিজের সংসারকে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম বানাতে হবে। আত্ম-সমর্পন করতে হবে কেবল এই এক বাবার কাছে, আর সর্বদাই ওঁনার গুণগান করতে হবে।

বরদান :- মনকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে 'মনমনাভব'-র মন্ত্রকে যন্ত্রে রূপান্তরকারী সদা শক্তিশালী ভব (হও)।

যে সকল বাচ্চারা সত্যিকারের মন থেকে প্রতিজ্ঞা করতে পারে, তাদের মন 'মন্মানাভব' হয়ে যায়, আর তখন এই মন্মানাভব-র মন্ত্র যে কোনও পরিস্থিতিকেই পার করার যন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু

মনে এমন সংকল্প আনতেই হবে যে, আমাকে এটা অবশ্যই করতে হবে। সংকল্পে এই বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে, বাবা যা কিছু বলেছেন, তা তো পূর্বেই সফল হয়ে আছে। তাই যে কোনও প্রতিজ্ঞাই, তা অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে মনে সংকল্প করতে পারলে, আত্মাও তাতে শক্তিশালী হতে পারবে। বার বার নিজেকে পরীক্ষা করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো যাতে বুঝতে পারো, প্রতিজ্ঞা আর পরীক্ষার মধ্যে কোনটা বেশি শক্তিশালী ? আর সেই পরীক্ষা এমন হবে যে, নিজের প্রতিজ্ঞা যেন কোনও ভাবেই দুর্বল না হয়ে যায়।

স্লোগান :- যে সকল শ্রেষ্ঠ আত্মা স্বমানের সাথে থাকে, কোনও কিছুতেই সে কখনও নিজেকে অপমানিত মনে করে না।